বন্যা-পরবর্তী পুনর্বাসন

ড.শোয়েব মামুন

দেশের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে আগস্টের শেষে এসে দেখা দিয়েছে ভয়াবহ বন্যা। এবারের বন্যাটা অস্বাভাবিক।বিজ্ঞানীরা বলছেন, বৈশ্বিক উষ্ণায়নই এ ধরনের বন্যার অন্যতম কারণ। তাঁরা বলছেন তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে হিমালয়ের গ্লেসিয়ার গলছে আশঙ্কাজনক হারে। বরফগলা সেই পানি তার স্বভাব অনুযায়ী নিচের দিকে আসছে আগের চেয়ে অনেক বেশি করে। সমুদ্রের পানির বাষ্পীভবনের হার আগের তুলনায় বেড়ে গেছে।ফলে পাহাড় ও সমভূমিতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণও বেড়ে গেছে। এ ছাড়া মানুষের উৎপাতে পাহাড়ের গাছপালা কমে গেছে। ফলে মাটির ক্ষয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাহাড় আগের মতো পানি ধরে রাখতে পারছে না। পাশাপাশি পাহাড় ধোয়া পানিতে থাকা পলির কারণে আমাদের নদীনালা-বিল-বাঁওড়গুলো ভরে যাওয়ায় সেগুলো তাদের স্বাভাবিক পানিধারণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে। ১৯ আগস্ট থেকে উজানে ত্রিপুরা এবং বাংলাদেশের সমগ্র পূর্বাঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়েছে। এসব অঞ্চলে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের পেছনে উপর্যুক্ত কারণগুলোর সঙ্গে লা-নিনার (La-Nina) প্রভাব আছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন।

দেশের উত্তর-পূর্ব ও পূর্বাঞ্চলে বন্যায় সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় ৫৭ লাখ মানুষ। পানিবন্দি হয়েছে প্রায় ১০ লাখ। এখন পর্যন্ত মারা গেছে ৫৯ জন।যারা পেরেছে, তারা অপেক্ষাকৃত উঁচুস্থানে, হাটে, স্কুলে, বাঁধে, বড় সড়কে কিংবা রেলস্টেশনে আশ্রয় নিয়েছে। যারা পারেনি, তাদের চোখের পানি বন্যার পানির সঙ্গে মিশে হয়েছে একাকার। তাদের ঘরবাড়ি ডুবে গেছে। ধানখেত তলিয়ে গেছে। পুকুর পরিণত হয়েছে অথৈ সাগরে । হাঁস-মুরগি, মাছ, গৃহপালিত পশু ভেসে গেছে সবই। এরই মধ্যে অনেক মানুষ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এগিয়ে এসেছে অসহায় বানভাসি মানুষকে উদ্ধার করার জন্য, তাদের কষ্ট লাঘবের জন্য । এদের মধ্যে আছে অনেক ছাত্র-যুবক। তারা শুকনো খাবার, পানি, ওষুধ ও কাপড় নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে আর্ত মানবতার পাশে।

চট্টগ্রাম, সিলেট ও খুলনা বিভাগে আকস্মিক বন্যাকবলিত মোট ২৩টি জেলা নির্ধারণ হয়েছে। যার মধ্যে ৯টি জেলা বেশি আক্রান্ত। এই ৯টির মধ্যে রয়েছে কুমিল্লা, নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর এবং সিলেটের মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ। জেলাগুলোতে এখনো রয়েছে বন্যার প্রভাব।এবারের বন্যায় অবকাঠামোর ব্যপক ক্ষতি হয়েছে। বন্যায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের কমবেশি দুই হাজার কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বন্যায় দৃশ্যমান বড় ক্ষতি হয়েছে কৃষি খাতে। অনেক এলাকায় 'কাটার উপযোগী' পাকা নাবি আউশ ধান তলিয়ে গেছে। রোপা আমনের বীজতলা, নতুন রোপণ করা আমন ধানের খেত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বেশির ভাগ জায়গায় আমন ধান তার বৃদ্ধি পর্যায়ের প্রথম দিকে ছিল। বাণিজ্যিক সবজিখেত ছাড়াও বসতবাড়ি লাগোয়া মিষ্টিকুমড়া, চালকুমড়া, লাউ, ঢ্যাঁড়শ, করলা, বেগুনখেত তলিয়ে গেছে পানির নিচে। স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ফল আম, কাঁঠাল, লেবু, আনারস, কলা, পেঁপে, সফেদাও নষ্ট হয়ে গেছে। আকস্মিক এই বন্যার কারণে বেশির ভাগ ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। এ ছাড়াও বেরিয়ে গেছে পুকুরে চাষ করা মাছ। বাড়িতে পালিত হাঁস-মুরগি গবাদি পশুর মৃত্যু এবং ভেসে যাওয়াসহ অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির খাদ্য এবং অন্যান্য পশুখাদ্য বিনষ্ট হয়েছে।এ দুর্যোগে দুধ, ডিমের প্রায় ৪১১ কোটি টাকা এবং অবকাঠামোসহ অন্যান্য ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১ হাজার ৫৯০ কোটি ৩৬ লাখ টাকা।

বন্যা-পরবর্তী পুনর্বাসনে বাসস্থান, কৃষি, মৎস্য ও স্বাস্থ্য সবচেয়ে বেশি জরুরি। এ অবস্থায় ক্ষতি পুষিয়ে নিতে নানা রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করছে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলো।এ জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় ব্যপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এরই মধ্যে মাঠ পর্যায়ের কৃষি কর্মকর্তারা ক্ষতির প্রকৃতি নির্ধারণ করে ফেলেছেন। কৃষি পুনর্বাসনের প্রয়োজনে তাঁরা তাঁদের কর্মপরিকল্পনাও ঠিক করে ফেলেছেন। সংশ্লিষ্ট বন্য কবলীত এলাকায় ত্রান ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়সহ খাদ্য মন্ত্রণালয়ও কার্যক্রম গ্রহণকরে বাস্তবায়ন শুরু করেছে।

এখন ভাদ্রের শেষ দিকে চলে এসেছি আমরা। আমন রোপণের স্বাভাবিক সময় শেষ। এমনকি নাবি আমন রোপণের শেষ সময় ৩১ ভাদ্র। আর উচ্চ ফলনশীল নাবি আমন হিসেবে শতভাগ আলোকসংবেদী জাত বিআর-২২, বিআর-২৩ এবং ব্রি ধান-৪৬ ও ব্রি ধান-৫৪-এর বিকল্প নেই। পাশাপাশি স্থানীয় জাত থেকে বাছাই করা আলোকসংবেদী জাত বিআর-৫, ব্রি ধান-৩৪ ও নাইজার শাইল আবাদ করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে ব্রির পরামর্শ হলো ১৫ সেপ্টেম্বরের (ভাদ্রের শেষ দিন) মধ্যে রোপণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে গোছাপ্রতি চার-পাঁচটি চারা ঘন করে (২০ থেকে ১৫ সেন্টিমিটার) রোপণ করতে হবে। চারা দাপোগ পদ্ধতি বা প্লাস্টিক ট্রে বা ভাসমান বীজতলায় তৈরি করে নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে চারার বয়স ১২ থেকে ১৫ দিন হলেই চলবে।এ ধরনের পরিস্থিতিতে আলোকসংবেদী বিআর-২২ এর ৩০ দিনের চারা ২১ আশ্বিন (৬ অক্টোবর) রোপণ করে বিঘাপ্রতি প্রায় ১২ মণ ফলন পাওয়া সম্ভব। তবে একই বয়সের চারা ভাদ্রের শেষ দিনে (১৫ সেপ্টেম্বর) রোপণ করে ফলন পাওয়া গেছে বিঘাপ্রতি ১৬ মণ। আশ্বিনের ১৫ তারিখের (৩০ সেপ্টেম্বর) মধ্যে রোপণ করতে পারলে একটা চলনসই ফলন পাওয়া যাবে। এ ক্ষেত্রে সেপ্টেম্বরের প্রথমে বীজতলায় বীজ ফেলা যেতে পারে। তবে দেরি করে রোপণ করলে ফলন কিছুটা কমে যাবে।

বন্যার পরে চারাগাছ সম্পূর্ণভাবে মাটিতে লেগে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে। সে ক্ষেত্রে ৬০ গ্রাম থিওভিট ও ৬০ গ্রাম পটাশ সার ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে স্প্রে করতে হবে। এ সময়ে গাছে মাজরা, বাদামি ও সাদা-পিঠ ঘাসফড়িং, পাতা মোড়ানো এবং পামরি পোকার আক্রমণের হাত থেকে রক্ষার জন্য পোকা বিশেষে হাতজাল, পার্চিং এবং প্রয়োজন হলে অনুমোদিত কীটনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে।

বন্যার পানিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি বা আংশিক হয়েছে এমন জমির ক্ষেত্রে বন্যার পানিতে ভেসে আসা কচুরিপানা, পলি, বালি এবং আবর্জনা যত দ্রুত সম্ভব পরিষ্কার করতে হবে। পানি সরে যাওয়ার পর ৫-৭ দিন কাদাযুক্ত ধানগাছ পরিষ্কার পানি দিয়ে প্রয়োজনে স্প্রে মেশিন দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে। পানি নেমে যাওয়ার পরপরই সার দেওয়া ঠিক নয়। এতে ধানগাছ পচে যেতে পারে। ১০ দিন পর ধানের চারায় নতুন পাতা গজানো শুরু হলে বিঘাপ্রতি ৮ কেজি ইউরিয়া ও ৮ কেজি পটাশিয়াম দিতে হবে।

বন্যার পানি কমে যাওয়ার পর তিন ধরনের রোগ ঐ সমস্ত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। এর মধ্যে রয়েছে পেটের সমস্যা, টাইফয়েড-প্যারা টাইফয়েড, হেপাটাইসিস। এ ছাড়া ছত্রাকের সংক্রমণ, পচড়া, ত্বকের অ্যালার্জিসহ ত্বকের অসুখ বাড়ে। পাশাপাশি শ্বাসের টান, হাঁচি-কাশি বেড়ে যায়।সমস্যা হলো বন্যাকবলিত এলাকায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রও পানিতে ডুবে গেছে।স্থানীয়ভাবে চালু ওষুধ ব্যবসায়ীদের ফার্মেসিগুলোও পানিতে ডুবে গেছে।ফলে ঐ সব এলাকার মানুষের কাছে স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেওয়া সবচেয়ে বড়ো চ্যালেন্জ হয়ে দাড়িঁছে। সে ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবিলার জন্য নৌ অ্যাম্বুলেন্স ও ভ্রাম্যমাণ মেডিক্যাল টিমের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সেরকারের পক্ষ থেকে বন্যা- পরবর্তী ডায়রিয়া পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রতিটি সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রসহ সকল ফার্মেসিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে স্যালাইন ও ওষুধ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোনোভাবেই ওষুধের দাম যাতে না বাড়ানো হয় সে বিষয়ে মনিটরিং জোরদার করা হয়েছে।

#

পিআইডি ফিচার